শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

'সমন্বয়' শব্দের অর্থ সম্যক অন্বয় বা সার্থক সামঞ্জস্য। 'অন্বয়' শব্দটির মধ্যেই সামঞ্জস্যের বা ইংরাজিতে যাকে বলে 'এগ্রীমেন্ট' (Agreement), তার ভাবটি নিহিত। সংহতি বা মিলনের ভাব পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার স্থায়িত্বের একটি আবশ্যিক মৌল শর্ত। কিন্তু সেই সংহতির ভিত্তির মৌল উপাদান কী? অর্থাৎ সংহতির আদর্শকে প্রয়োগিক রূপ দিতে হলে কোন্ বস্তুটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন? এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন---সমন্বয়। তিনি বলতেন : "যে সমন্বয় করেছে, সে-ই লোক।" (কথামৃত, উদ্বোধন, সং, ১৯৮৬, পৃ: ৫৯৩)। 'সমন্বয়' বলতে আমরা সাধারণত মিলনকেই বুঝে থাকি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে আমরা সমন্বয়ের গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্যের সন্ধান পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাবনার সামঞ্জস্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই সারদাদেবী শিখেছিলেন সমঞ্জস্যের পরম কথাটি ঃ "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" বস্তুতঃ, সামঞ্জস্য বা 'এডজাস্টমেন্ট' বা 'এগ্রীমেন্ট' বা 'কো-অর্ডিনেশন' বা 'ব্যালান্স' ভিন্ন আমরা আমাদের জীবনে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারি না। সামঞ্জস্য বা 'ব্যালান্স' প্রকৃতির পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে জীবন রসহীন, বর্ণহীন হতে বাধ্য। 'সামঞ্জস্য' মানে রক্ষণ ও বর্জনের মধ্যে সমন্বয়। 'সামঞ্জস্য' মানে কিছু ত্যাগ এবং সেইসঙ্গে কিছু গ্রহণ বা স্বীকার। 'ত্যাগ' এমন কিছু যাকে আমার প্রিয়, যা আমার পছন্দের, যা আমার কামনার। 'গ্রহণ' বা 'স্বীকার' তাকে যা আমি পেতে চাই না, যা আমি পছন্দ করি না, যার সম্পর্কে আমার আন্তরিক বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের কাছে এই সমঞ্জস্যের কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে সংসারে আনন্দ ও শান্তির এক সার্থক আবহ রচিত হয়। সে শিক্ষা ছিল পরিবারের সকলকে নিয়ে, ছোট-বড় প্রত্যেকের মতকে, বিশ্বাসকে, নীতিকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে একসঙ্গে চলবার শিক্ষা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি সংসারী ছিলেন? অবশ্যই ছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী তাঁর কাছেই থাকতেন। শুধু জীবনকালেই নয়, তাঁর অবর্তমানেও যাতে তাঁর ভরণ-পোষণের কোনো অসুবিধা না হয় সে-ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছিলেন। তাঁর গর্ভধারিণী শেষবয়সে তাঁরই কাছে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাস করতেন। একসময় তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পুরোহিতের কর্ম করতেন এবং কর্মে নিয়োজিত না থাকলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুরো বেতন বাবদ মাসিক সাত টাকা করে তাঁকে দেয়া হতো। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে একে তিনি 'পেন্সিল' (পেনসন) পাওয়া বলতেন। ভাইপো রামলালের কালীবাড়িতে পুরোহিতের চাকরি তাঁর সৌজন্যে হয়েছিল। ভাগিনেয় হৃদয় এবং জ্ঞাতিভাই হলধারীও কালীবাড়িতে পৌরোহিত্য কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে রানী রাসমণি এবং তার দক্ষিণহস্ত জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের সুসম্পর্কের সুবাদে। হৃদয় ও হলধারীর সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি। অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন এবং সে রকম নিজেও আচরণ করতেন। তাঁর সহধর্মিণীকে লোকব্যবহারই শুধু নয়, সাংসারিক অন্যান্য কর্তব্য-কর্মও তিনি নিখুঁতভাবে শিক্ষা দিতেন। জন্মভূমি কামারপুকুর এবং কামারপুকুরের মানুষের সঙ্গে, ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আজীবন ছিল। এ সমস্ত বিষয় তাঁর সংসারী জীবনেরই পরিচয় বহন করে।

তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর সহধর্মিণী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে এবং তাঁর অবর্তমানে সুদীর্ঘকাল সংসারের মধ্যে থেকে সংসারীদের কাছে সমন্বয় তথা সামঞ্জস্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও প্রত্যাশার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। এক বিচিত্র সংসারে তিনি বাস করতেন। তাঁর সংসার ছিল এক অর্থে বিচিত্র জগৎ রূপ সংসারেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। তাঁর সেই সংসারে একদিকে ছিলেন প্রথম জীবনে বিধবা হওয়ার কারণে বিকৃতমস্তিষ্ক তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ---ভক্তমহলে 'পাগলী মামী' নামে যিনি পরিচিত---এবং তাঁর একমাত্র কন্যা রাধু, স্বভাবে যিনি ছিলেন প্রচণ্ড অভিমানী, খেয়ালী এবং একগুঁয়ে। জন্মের আগেই পিতৃহারা এবং জন্মের পরে প্রায় মাতৃহারা এই রাধুকে সারদাদেবী পরম স্নেহে মানুষ করেও ছিলেন। রাধুর আবদার ও বাহানার অন্ত ছিল না। কখনও কখনও সেই আবদার ও বাহানা মাত্রা ছাড়িয়ে অন্যের বিরক্তির কারণ হতো। ছিলেন তাঁর আর দু ভ্রাতুষ্পুত্রী। মাতৃহীন এই দু ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও সারদাদেবী পরম মমতায় কাছে রেখেছিলেন। এদের মধ্যে বড় নলিনী ছিলেন অত্যন্ত মুখরা, সঙ্কীর্ণমনা, হিংসুটে এবং শুচিবায়ুগ্রস্তা। অপরজন মাকু ছিলেন অভিমানী এবং অবুঝ। রাধুকে শ্রীশ্রীমা বেশি ভালোবাসেন ভেবে তাঁরা পদে পদে মায়ের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন। আবার পাগলী মামীর সঙ্গে নলিনীর ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক---একজন অপরকে সহ্য করতে পারতেন না। নলিনী ও পাগলী মামীর ঝগড়ায় মা ভিন্ন সকলেই অতীষ্ঠ হতেন। পাগলী মামী তো একাই একশ, তার উপর নলিনীর সঙ্কীর্ণতা, মুখঝামটা এবং শুচিবাইয়ের প্রাবল্যে মায়ের সংসার সর্বদা উত্তপ্ত হয়েই থাকত। এর উপর ছিলেন মায়ের লোভী, স্বার্থপর, কলহপরায়ণ সহোদরগণ। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে এবং ঈর্ষার বশে মায়ের জীবনকে মাঝে মাঝেই তাঁরা দুর্বিষহ করে তুলতেন। আবার সঙ্কীর্ণমনা ও অসূয়াপরায়ণ জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং প্রতিবেশিদের অসহযোগিতার তরঙ্গও মায়ের সংসারকে মাঝে মাঝেই সংক্ষুব্ধ করে তুলত।

এ-ই সব নয়। মায়ের সংসারে ছিল বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ, হঠাৎ-করে-উপস্থিত-হওয়া পাগলাটে লালু জেলের উৎপাত, মুসলমান মুনিষ-মজুরের দল, যাদের মধ্যে কারও কারও ছিল চুরি-ডাকাতি আর হাজতবাসের দুর্নাম। ছিল গৃহপালিত গরু, বিড়াল, টিয়া-পাখি। ছিলেন সাধারণ ও অসাধারণ অতিথি অভ্যাগতবৃন্দ, শহর ও মফস্বলের সাধারণ ও বিশিষ্ট ভক্ত নারনারী। ছিলেন যোগীন মার মতো স্থির-শান্ত সঙ্গিনী, গোলাপ মার মতো মুখরা ও কটুভাষিণী অভিভাবিকা। ছিলেন সাধু-ব্রহ্মচারীরা। ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান কর্মপরিচালক স্বামী সারদানন্দ। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণে গঠিত ছিল শ্রীশ্রীমায়ের বিচিত্র গৃহস্থালী। কিন্তু এক অসাধারণ কুশলতায় মা এই বিচিত্র পরিবেশে সকলকে নিয়ে সুচারুভাবে তাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। কেউ কখনো তাঁকে স্থৈর্য ও ধৈর্য হারাতে দেখে নি। তাঁর এই অতুলনীয় কৃতিত্বের রহস্য কী, সে সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, "যা কিছু কর না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে লক্ষ্য রাখতে হয়---যাতে বেশি খারাপ না হয়।... দেখ, সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।... ভাবি, তাঁর সংসার, তিনিই দেখছেন।" (শ্রীমা সারদাদেবী---(স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭)

একাত্মতা ও নির্লিপ্ততার---সংযুক্তি ও বিযুক্তির কী অসাধারণ সামঞ্জস্য, কী অপূর্ব সমন্বয়! আসলে, গৃহস্থাশ্রমে কেমনভাবে সমন্বয় বা 'ব্যালান্স' করতে হয় তার সার্থক ছবিটি আমরা পাই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে। তাঁর জীবন থেকে উঠে আসা এ দৃষ্টান্তই শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ও নির্দেশিত সমন্বয়-কৌশল।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৌশল শুধু গৃহী বা সংসারীদের জন্যই নয়,---সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক---সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। প্রযোজ্য সন্ন্যাসীর জন্যও। কারণ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীও। সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবেই। আবার তাঁর আদর্শ সমগ্র জগতের জন্যও। সেই আদর্শকে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সামনে

এবং জগতের সামনেও তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি বলেছিলেন, সমন্বয় ভারতবর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্য। সেই সমন্বয় 'টলারেন্স' ও 'অ্যাক্সেপট্যান্স'-এর সমন্বয়। সহন এবং গ্রহণের ভিত্তিতেই গড়তে হয় সমন্বয়ের ইমারত। সহিষ্ণুতা এবং গ্রহিষ্ণুতার যেখানে অভাব, সেখানেই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রধান, নিজ নিজ মতের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় প্রবল বিক্রমে উদ্যোগী সেখানে শান্তি আসতে পারে না। সে গৃহীর সংসারেই হোক, অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রেই হোক। নিজের মতকে কেন্দ্র করে যে গোঁড়ামি, যে সঙ্কীর্ণতা, যে মৌলবাদী মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, একে অপূর্ব একটি শব্দে চিহ্নিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি একে বলতেন 'মতুয়ার বুদ্ধি'। কথামৃতকার এর ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়েছেন 'ডগম্যাটিজম'।

শ্রীরামকৃষ্ণ তীব্র ভাষায় মতুয়ার বুদ্ধি বা মানসিকতার নিন্দা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে, মতুয়ার বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মত কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কারণ তা খণ্ডিত বা আংশিক হতে বাধ্য। তিনি এ প্রসঙ্গে অন্ধের হাতী দেখার উপমা দিতেন :

"কতগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ-জানোয়ারটির নাম হাতি। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, হাতিটা কিরকম? তারা হাতির গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, 'হাতি একটা থামের মতো!' সে-কানাটি কেবল হাতির পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, 'হাতিটা একটা কুলোর মতো!' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এইরকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল।" (কথামৃত ঃ পৃ. ১৭৫) 'থামের মতো', 'কুলোর মতো', 'দড়ির মতো', 'জালার মতো'---এগুলি হাতি সম্বন্ধে এক-একজন অন্ধের চূড়ান্ত ধারণা, কিন্তু আসলে এদের কোনোটিই তো এককভাবে সত্য নয়। আবার এদের সবগুলো মিলিয়ে নিলেও হাতি সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা নাও হতে পারে। সুতরাং তাদের ধারণাকে চূড়ান্ত বলে ভাবা হাস্যকর। এখানেই আসছে অপরের মত ও ধারণাকে সহ্য করার এবং স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা। এটাই 'সমন্বয়'। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সব মতকে ঐভাবে দেখার মাধ্যমে সত্যদৃষ্টি আসে। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক-কে দেখার এই বিশ্বাস ও দৃষ্টিই তাঁর মতে 'সমন্বয়'। (দ্রঃ ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রবাণী ঃ "যত মত তত পথ।" তাঁর সর্বমত ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের এই উপদেশ ও ভাব সর্বজনবিদিত এবং বহু আলোচিত। বর্তমান পৃথিবীতে মানবসভ্যতার এটাই যে রক্ষাকবচ সে-কথা চিন্তাশীল সকলেই স্বীকার করছেন। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং মতান্ধতাই মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের প্রাচীর তুলে দেয়। তার মূলে থাকে মানুষের নিজের মত সম্পর্কে, নিজের বিশ্বাসের প্রাধান্য সম্পর্কে আত্মম্ভরিতার ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন, অপরের মতের প্রতি, অপরের বিশ্বাসের প্রতি, অপরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ভাব না আনতে পারলে আখেরে নিজেরই ক্ষতি। তাঁর ভাব হলো---অপরকে প্রেমে, সহিষ্ণুতায়, ভ্রাতৃভাবে ছাড়িয়ে যাও, কিন্তু দম্ভে, অসহিষ্ণুতায়, উপেক্ষায় কাওকেও মারিয়ে যেও না। জগতে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মেই থাকবে, মানবিক স্বভাবের বশেই থাকবে, কিন্তু সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের ভাবও তো প্রাকৃতিক ভাব, মানুষের ভাব। আর যদি প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকেই তবে তাকে সহযোগিতা প্রসারের জন্য, সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য, সমন্বয়ের বিকাশের জন্য নিয়োজিত করি না কেন! প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক শান্তির জন্য, সমন্বয়ের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ সাবধান! দ্বেষবুদ্ধি, বিদ্বেষ-ভাব, ঘৃণা যেন মনে না থাকে। প্রতিটি স্তরে ভালোবাসা যেন তার ভিত্তি হয়।

বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীকে একটি গৃহে, নিখিল মানবসমাজকে একটি পরিবারে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। 'নানা'র অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে নানার মধ্যে পরম 'এক'কে আবিষ্কার করেছিলেন। সে স্বপ্ন কি তা হলে স্বপ্নই থেকে যাবে? সেই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফল কি জগতের কোনো কাজেই আসবে না? এ পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে একটি ভাব দিয়ে গেলেন। তা হলো এই : আমরা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র (Unity in

Diversity) কথা শুনেছি। তা যথার্থ উপলব্ধি অবশ্যই, কিন্তু 'ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য'-ও ('Diversity in Unity ') তো একইভাবে সত্য। এক ঈশ্বর যদি সত্য হন, তাহলে তাঁকে পাবার জন্য বিচিত্র পথের বিদ্যমানতা তো একইভাবে সত্য হতে বাধ্য। সুতরাং পথের বিভিন্নতা থাকুক না। পৃথিবীর যতগুলো মানুষ, ততগুলো ধর্মমত থাকলেই বা ক্ষতি কী! তাতে তো ঈশ্বরকে ধরবার, সন্ধান করবার জন্য মানুষের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে। তা তো মানুষের মানসিক ও আত্মিক সুস্থতা ও সজীবতারই প্রকাশ। শুধু বুঝতে হবে, এ বৈচিত্র্যের উৎস ও গতি এক-এ। এতে মৌলবাদ মাথা তুলতে পারবে না। সহস্র সম্প্রদায় সত্ত্বেও কারও মনে সাম্প্রদায়িকতা শিকড় গাড়তে পারবে না।

এ দৃষ্টির ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, ঐহিকে এবং পারত্রিকে কোনো ব্যাবধান নেই। দ্বৈতে, বিশিষ্টাদ্বৈতে এবং অদ্বৈতে কোনো বিরোধিতা নেই। জড় ও চৈতন্যে কোনো পার্থক্য নেই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান মতে কোনো বিভেদ নেই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব মতে কোনো ভেদ নেই। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, যোগের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে, মানুষ ও দেবতার মধ্যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে, ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে, অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যার মধ্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রকৃত কোনো দূরত্ব নেই। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত বা বিরুদ্ধ মনে হলেও প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির পরিপূরক। তাদের চূড়ান্ত সমন্বয়-দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন।

এ দৃষ্টি জগতের চিন্তাজগতে, ধর্মজগতে এবং ভাবজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব অবদান। স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য বলেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা---"সমন্বয়াচার্য"। তাঁর জীবনটিই ছিল সমন্বয়ের সাকার চেতন প্রকাশ। সেই সমন্বয়ের মহাবাণীকে জগতের রক্ষামন্ত্ররূপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন শিকাগোর ধর্মমহাসভার সমাপ্তি ভাষণে : "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

সমন্বয় মানে স্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তি নয়, স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ধান নয়। 'সমন্বয়' মানে কোনোভাবেই সুবিধাবাদ নয়। সমন্বয় মানে নিজের নীতিতে শতকরা একশ ভাগ স্থির থেকে---"বৈঠিয়া আপনা ঠাম"---অপর ব্যক্তি বা বিষয়কে সশ্রদ্ধ ও সানন্দ স্বীকৃতিদান। স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে, বৈশিষ্ট্যকে অটুট রেখে এক ঐকতান বা 'অর্কেস্ট্রা' বা 'কনকর্ড'বা 'সীম্ফনী'র সৃষ্টিই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য। তা দেখাতে ও বুঝাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পাই শ্রীশ্রীমায়ের কথায়---"আমাদের ঠাকুরের সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না।... সাধুপুরুষরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক রকম বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটি গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখি এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল গুলিকে আমরা পাখির বোল বলি। একটিই পাখির বোল আর অন্যগুলি পাখির বোল নয়---এরূপ বলি না।" (মায়ের কথা, ১ম ভাগ, ৯ম সং, ১৩৭৬, পৃঃ ৪৭) এই ঐক্য ও সামঞ্জস্য-দৃষ্টিই শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাবনার মূলকথা এবং জগতের উদ্দেশে উচ্চারিত এক মহাবাণী। *